বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে গৃহীত প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

ভূমিকা

গত ২০-২৩ নভেম্বর ২০১৪ আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত ও বিকশিত রূপ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণতিতে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের ভিত্তিতে দলের চিন্তাকে সংহত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্ট ২০১২ সালে সূচিত এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ওই কনভেনশনে সমকালীন বিষয়াবলী যুক্ত করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। কনভেনশনের প্রতিনিধিদের প্রস্তাব, সংশোধনী মতামত যুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য
বাসদ (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি) ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রত্যয় নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে অতীত সংগ্রামের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ঘোষণা করেছে। সেই লক্ষ্যে পার্টির এই বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে পার্টির সঠিক লাইন নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিসমূহ মার্কসবাদী বিচারধারায় বোঝা ও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ তুলে ধরা অতি জরুরি।

আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে সংশোধনবাদের যে আক্রমণ মার্কসের সময় থেকেই ছিল, তাই বর্তমানে নতুনরূপে আধুনিক সংশোধনবাদ হিসাবে সমগ্র বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে এমন মারাত্মক বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে যে বিপ্লবের সকল সম্ভাবনা (অবজেক্টিভ কন্ডিশন) থাকা সত্ত্বেও আদর্শগতভাবে প্রস্তুত না থাকায় বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালীরূপে গড়ে উঠতে পারছে না। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলোসহ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যা সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। তা প্রথমে আধুনিক সংশোধনবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রে ভেঙ্গে গেছে এবং পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নিপতিত হয়েছে পুঁজিবাদী হায়েনাদের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে। বর্তমানে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংকটের কারণে দুঃসহ দারিদ্র, তীব্র বেকার সংকট, শ্রমিক ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে নানারূপে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, পারিবারিক সংকট, মূল্যবোধের সংকট, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক সংকট প্রভৃতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। এইসব সংকট থেকে মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকশিত করার লক্ষ্যে শোধনবাদের কবল থেকে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করা খুব জরুরি।

মহান লেনিন তাঁর সময়ে বিশ্ব পরিস্থিতিতে যে তিনটি প্রধান দ্বন্দ্ব (major contradiction), যা বিশ্বের সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করে বলে দেখিয়েছিলেন তা হলো : (১) সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজি ও শ্রম অর্থাৎ মালিক ও মজুরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; (২) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে পরাধীন দেশ বা উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশিক দেশগুলির দ্বন্দ্ব; এবং (৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একের সাথে অপরের দ্বন্দ্ব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে স্ট্যালিন চতুর্থ প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখান। বিশেষ পরিস্থিতিতে এদের কোনো একটি দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে দেখা দেয় এবং বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আবার এই প্রধান দ্বন্দ্বগুলি স্থায়ী দ্বন্দ্ব নয়। এদের যেমন বিশেষ পরিস্থিতিতে আবির্ভাব ঘটে, তেমনই আর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকারিতা হারায়। মহান স্ট্যালিনের পরবর্তী সময়ে নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া দেশগুলি তাদের দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের কোনোটিতে যোগ না দিয়ে, দু'পক্ষ থেকেই সাহায্য নেবার জন্য জোট নিরপেক্ষ নীতি (non-alignment policy) গ্রহণ করেছিল। এই দ্বন্দ্বের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, এটি একটি প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র অর্জন করেছে, ফলে এটিকে পঞ্চম দ্বন্দ্ব হিসেবে গণ্য করা যায়।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সকল প্রধান দ্বন্দ্বগুলির কয়েকটির কার্যকারিতা আর নেই (no more valid)। যেমন বহু দিন পূর্বেই উপনিবেশ এবং আধা ঔপনিবেশিক দেশসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করায় সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে ওইসব দেশের জনগণের যে দ্বন্দ্ব ছিল, তার অবসান হয়েছে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করে রাশিয়া এবং চীনে প্রতিবিপ্লবের পথে পুঁজিবাদের পুনঃস্থাপনের ফলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের যে দ্বন্দ্ব একটি প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে কাজ করছিল, সেটাও অবলুপ্ত হয়েছে। যদিও উত্তর কোরিয়া এবং কিউবাতে সমাজতন্ত্র এখনও টিকে আছে, এবং তার সাথে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বও বর্তমান, কিন্তু তা বিশ্ব পরিস্থিতি

প্রভাবিত করার অর্থে একটি প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে কাজ করছে না, যদিও কখনও কখনও তা তীব্র হয়ে দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের অবলুপ্তির ফলে বিকাশশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির (যাদের non-aligned countries বলা হত) দুটি বিরোধী শিবিরের যে দ্বন্দ্ব যাকে ৫ম প্রধান দ্বন্দ্ব বলা হয়েছিল, তাও (non-operative) অকার্যকরী হয়ে পড়েছে। ফলে যে প্রধান দ্বন্দ্বগুলি আজ বিশ্বের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা হলো : (১) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, (২) পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজি এবং শ্রম, অর্থাৎ মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব। আর একটি দ্বন্দ্ব যা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কার্যত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে, তা হলো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে বিকাশশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব আজ এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে যুদ্ধাবস্থার, এমনকি যুদ্ধেরও সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতসহ কিছু পুঁজিবাদী দেশ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ করছে। ফলে তাদের সাথে পিছিয়ে পড়া দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে।

পুঁজি গ্রন্থে পুঁজির পুঞ্জীভবনে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ

মহামতি কার্ল মার্কস পুঁজি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শিল্প ও ব্যাংকিং পুঁজির উৎপত্তি আর বিকাশ মানব ইতিহাসে কখন কিভাবে হয়েছিল। বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বের চলমান ঘটনাসমূহকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝতে গেলে পুঁজি গ্রন্থের এই অধ্যায়সমূহ কিছুটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কার্ল মার্কস পুঁজি গ্রন্থের ৩১তম অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগে অর্থাৎ যখন সামন্তীয় উৎপাদন ব্যবস্থার গহ্বরে পুঁজিবাদের ভ্রূণ তৈরি হচ্ছিল সেসময়েই মহাজনী পুঁজি এবং বণিকী পুঁজি এ দু'ধরনের পুঁজি গড়ে ওঠে। অতীতে সামন্তীয় ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুরা তাদের তৎকালীন আইন ও সংগঠনের (guild) মাধ্যমে এই মহাজনী ও বণিকী পুঁজি থেকে শিল্প পুঁজি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। কিন্তু সামন্ততন্ত্র উৎখাতের মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকল না। এরপর তিনি দেখালেন, আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের আবিষ্কার, আদিম জনগোষ্ঠির খনিতে দাসত্ব বরণ করে কবরস্থ হওয়া, ইস্ট ইন্ডিস্ জয় এবং লুণ্ঠন, কালো মানুষদের নিয়ে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আফ্রিকাকে খরগোশের গর্ত বানিয়ে ফেলা প্রভৃতি ঘটনা ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের রঙ্গিন প্রত্যুষের ইঙ্গিত বহন করছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, আজ যেমন শিল্পের উৎকর্ষ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সৃষ্টি করে; মধ্যযুগে আবার বাণিজ্যের উৎকর্ষই শিল্পের (কারখানা) গুরুত্ব এনে দিত। এ কারণেই সেসময়ে উপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রাধান্য গড়ে উঠেছিল। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এটিই ঘোষিত নীতি ছিল যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনই মানবতার প্রধান লক্ষ্য ও শেষ কথা।

কার্ল মার্কস এ অধ্যায়ে আরও দেখান যে, সরকারি ঋণ বা জাতীয় ঋণ (national debt) ব্যবস্থার উদ্ভব মধ্যযুগে যার উৎপত্তিস্থল ছিল জেনোয়া এবং ভেনিস। খুব অল্প সময়ে জাতীয় ঋণ ব্যবস্থা ইউরোপ দখল করে ফেলল। রাষ্ট্রের যে কোনো রূপ একচ্ছত্র রাজতন্ত্র, সাংবিধানিক অথবা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় ঋণের উপস্থিতি পুঁজিবাদী যুগের প্রারম্ভ ইঙ্গিত করে। ফলে পুঁজিবাদে জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের যৌথ মালিকানা খানিকটা জাতীয় ঋণের রূপেই এসে গেল। এ থেকেই নতুন ধারণার জন্ম হলো যে একটি জাতির জাতীয় ঋণ যত অধিক হবে সে তত ধনী। এভাবে মার্কস দেখান যে, জাতীয় ঋণ পুঁজির প্রাথমিক পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়ায় অলস পুঁজির কলেবর বেড়ে আরও বৃহৎ পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা বেড়ে গেল। শিল্প অথবা সুদ ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের যে ঝামেলা এবং ঝুঁকি রয়েছে তার কোনো কিছুই উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় নেই। মার্কস দেখালেন যে, অলস পুঁজির মালিকরা সরকারকে ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই তাদের পুঁজিকে পাবলিক বন্ডে রূপান্তরিত করে ফেলে যা হার্ড ক্যাশের সমান কার্যকরী। এসকল সরকারি ঋণের একটা অংশ যদিও জমির মালিক, ব্যবসায়ী অথবা বেসরকারি উৎপাদকদের কাজে লাগে কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জ গড়ে উঠেছে যার দ্বারা নানা দেনা-পাওনা এবং দেশী-বিদেশি মুদ্রা নিয়ে স্বতন্ত্র মুদ্রা কারবার গড়ে উঠেছে যাকে স্টক এক্সচেঞ্জের জুয়া এবং ব্যাংকক্র্যাসী (bankocracy) বলে কার্ল মার্কস অভিহিত করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে জন্মলগ্নে জাতীয় উপাধিতে ভূষিত বড় ব্যাংকগুলো বাস্তবে বেসরকারি ফাটকা কারবারীদের কতগুলো সংগঠন যারা এমনকি সরকারকে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করেছিল। জাতীয় ঋণের পুঞ্জীভবন এসকল ব্যাংকসমূহের স্টক বাড়িয়ে চলল যার পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ দেখা যায় ১৬৯৪ সালে 'ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড' আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। জাতীয় ঋণ ব্যবস্থার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদান পদ্ধতি গড়ে উঠল যা প্রায়শই তাদের প্রাথমিক গড়ে ওঠার পদ্ধতি গোপন রাখত। মার্কস

উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল। হল্যান্ড একটি জাতি হিসাবে শিল্প ও বাণিজ্যে শক্তি হিসাবে টিকে থাকতে পারছিল না। ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত তারা ব্যবসা হিসাবে বেছে নিয়েছিল প্রধানত তাদের প্রধান শত্রু ইংল্যান্ডকে বিপুল পরিমাণ পুঁজি ধার হিসাবে দেয়া। মার্কসের সমসাময়িক কালে তিনি দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডও কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করেছে এবং কিভাবে এক সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি হয়ত বিগত দিনে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেছে।

মার্কস আরো দেখালেন যে সরকার বাৎসরিক সুদসহ জাতীয় ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে রাজস্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যার ফলে পরিপূরক আধুনিক কর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কর প্রদানকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে না দিয়ে তাদের অর্থের বিনিময়ে সরকার ঋণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অস্বাভাবিক ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করে। এর পরিণামে সরকার ক্রমাগত আরো বড় ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি আবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বর্ধিতকরণ এবং এর উপর অধিক হারে অপ্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভর করেই টিকে আছে। কার্ল মার্কস দেখাচ্ছেন যে উচ্চ কর আরোপ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয় বরং তা পুঁজিবাদের একটি নীতি। কার্ল মার্কস আরো উল্লেখ করেছেন যে, এ ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি মজুরি শ্রমিকের যে দুরবস্থা সৃষ্টি করছে তা বরং কিছুটা কম উদ্বেগ তৈরি করে যখন তিনি দেখেন যে এ প্রক্রিয়ায় চাষী, কারিগর এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের একটি বিশাল অংশের কাছ থেকে সম্পদ বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং এই সম্পদ আত্মসাতের ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে নানাভাবে তাকে সুরক্ষিত করে।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর - লেনিন

কার্ল মার্কসের পর তাঁর মহান উত্তরসূরী লেনিন দেখান যে কিভাবে মার্কসত্তোর সময়ে তাঁর প্রতিটি বিশ্লেষণ নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। লেনিন দেখান যে শিল্পের অস্বাভাবিক বিকাশ এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উৎপাদন পুঞ্জীভবনের ফলে আরও বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান যে, তাঁর সমকালে জার্মানিতে সর্বমোট ৩২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০ হাজার ৫৮৮টি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান ছিল যা শতকরা ০.৯ ভাগ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শতকরা ৩৯.৪ ভাগ শ্রমিক নিয়োগ করেছে; শতকরা ৭৫.৩ ভাগ অশ্বশক্তি ব্যবহার করেছে এবং শতকরা ৭৭.২ ভাগ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ একশত ভাগের এক ভাগ প্রতিষ্ঠান প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করেছে। আর শতকরা ৯১ ভাগ প্রতিষ্ঠান শতকরা ৭ ভাগ বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করেছে। লেনিন তাঁর সময়কার অপর একটি শিল্পন্নোত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দেখান যে এই দেশটির উৎপাদনে পুঞ্জীভবন আরও বেশি। ১৯০৪ সালে এই দেশে ১০ লক্ষ ডলারের বেশি উৎপাদন এধরনের কোম্পানির সংখ্যা সর্বমোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮০টির মধ্যে ১৯০০টি যা শতকরা ০.৯ ভাগ। এদের শ্রমিক সংখ্যা ৫৫ লক্ষের মধ্যে ১৪ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ২৫.৬ ভাগ। এদের উৎপাদন ১৪৮০ কোটি ডলারের মধ্যে ৫৬০ কোটি ডলার। পাঁচ বছর পরে দেখা যায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৯১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩০৬০টি প্রতিষ্ঠান যা শতকরা ১.১ ভাগ। তারা প্রায় ৬৬ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ২০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত করেছে যা শতকরা ৩০.৫ ভাগ। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০৭০ কোটি ডলারের মধ্যে ৯০০ কোটি ডলার উৎপাদন করে যা মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৩.৮ ভাগ।

উৎপাদনের এ পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ একচেটিয়া রূপ লাভ করে। পুঁজিবাদের বিকাশের পথে একচেটিয়া রূপই হল তার সর্বাধুনিক পর্যায়। ব্যাংকের ভূমিকার কারণে তা অপ্রতিহতভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পুঁজির পুঞ্জীভবনের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজি জন্মাবার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ শিল্পপতিদের থেকে ব্যাংকের হাতে চলে যায়। এদিকে আবার ব্যাংকিং পুঁজিরও শিল্পে বিনিয়োগ ছাড়া টিকে থাকা অথবা বিকাশের কোনো পথ নেই। এভাবে ব্যাংক পুঁজি যখন শিল্পে নিয়োজিত হয় তখন সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই লগ্নী পুঁজির (finance capital) সৃষ্টি হয়। এর ফলে পুঁজিবাদে অবাধ প্রতিযোগিতার রূপটি তিরোহিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান হারে তা একচেটিয়া রূপ নিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি এসে পুঁজিবাদে আমরা যে একচেটিয়া রূপ দেখতে পাই তার একটি বৈশিষ্ট্য হল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শক্তিশালী সংগঠন এবং অপর বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত ধনী কিছু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অবস্থান যেখানে বিপুল পরিমাণ পুঁজির সঞ্চয় হয়েছে। এসকল উন্নত দেশে বিশাল আকারের উদ্বৃত্ত পুঁজির উদ্ভব হয়। লেনিন দেখালেন যে, পুঁজিবাদ যতদিন

টিকে থাকবে উদ্বৃত্ত পুঁজি জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে না কারণ তা পুঁজিপতিদের মুনাফা কমিয়ে দেবে। বরং উদ্বৃত্ত এই পুঁজি আরও অধিক মাত্রায় মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রসমূহে রপ্তানি করা হয়।

লেনিন দেখান যে একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট প্রথমত দেশীয় বাজারকে বিভক্ত করে নিজ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জাতীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে গাঁটছড়া বাধা। পুঁজিবাদ বহু পূর্বেই আন্তর্জাতিক পুঁজির জন্ম দিয়েছে। পুঁজির রপ্তানি যতই বেড়ে চলেছে এবং বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংগঠন যত বিকশিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কার্টেল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তত বেশী মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। এটি পুঁজি এবং উৎপাদনের পুঞ্জীভবনের একটি নতুন স্তর যা তার পূর্বের সকল স্তরকে অতিক্রম করে আরো বৃহদাকার একচেটিয়া পুঁজির (super monopoly) জন্ম দিয়েছে এবং বিশ্বকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। কাজেই লেনিন বলছেন যে এ সময়কালে পুঁজিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্ব কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; যদিও এর মানে এই নয় যে পুনর্বিভাজন অসম্ভব বরং তা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রথমবারের মত কয়েকটি অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা বিশ্ব পরিপূর্ণভাবে বিভক্ত যার শুধুমাত্র পুনর্বিভাজন হতে পারে। কাজেই বিশ্বে বর্তমানে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন এসে গেল যেখানে লগ্নী পুঁজির রাজত্ব। অর্থাৎ এই পর্যায়ে রাজ্য দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন নয় বরং বিদেশি অপর একটি পুঁজিবাদী দেশে লগ্নী পুঁজি রপ্তানি করে তার দাপটে অর্থনৈতিক শোষণ। কমরেড লেনিন আরও দেখান যে, পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক পর্যায় হলো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংগঠনসমূহের দৌরাত্ম্য। যেমন এগুলোর শক্তিশালী ভূমিকা দেখা যায় যখন হয়ত কোনো একটি গ্রুপ কাঁচামালের সকল উৎস দখল করে ফেলে। এসকল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো তখন প্রতিটি পদক্ষেপে কি পরিমাণ প্রয়াস চালায় যাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা মূল্যবান কাঁচামাল সামগ্রী যেমন, লোহা, তেল প্রভৃতি ক্ষেত্র ক্রয়ে এমনকি প্রতিযোগিতার সুযোগও না পায়। পুঁজিবাদ যত বিকশিত হয় তত কাঁচামালের ঘাটতি অনুভূত হয়, তত প্রতিযোগিতা এবং কাঁচামাল শিকার তীব্র হয় এবং তত উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদী প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

এরপর লেনিন ১৯১৬ সালে তাঁর রচনা Imperialism and the Split in Socialism-এ উল্লেখ করেন যে আমেরিকা, ইউরোপ এবং কিছুটা পরে এশিয়ায় ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ এর মধ্যে পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হয়েছে। তিনি বলছেন যে ১৮৯৮ সালে স্প্যানিশ-আমেরিকার যুদ্ধ, ১৮৯৯-১৯০২ সালে অ্যাংলো-বোয়ের যুদ্ধ, ১৯০৪-১৯০৫ সালে রুশ-জাপানের যুদ্ধ এবং ১৯০০ সালে ইউরোপে অর্থনৈতিক সংকট বিশ্ব ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে। ১৯১৪-১৯১৮ সালে শুরু হল নারকীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৯০ লক্ষ সৈন্য এবং ৭০ লক্ষ সাধারণ নাগরিক মৃত্যু বরণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিন বলেন, "The [First World] war is being waged for the division of colonies and the robbery of foreign territory; thieves have fallen out–and to refer to the defeats at a given moment of one of the thieves in order to identify the interests of all thieves with the interests of the nation or the fatherland is an unconscionable bourgeois lie." অর্থাৎ "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে উপনিবেশসমূহকে আরো বিভক্ত এবং বিদেশি অঞ্চলগুলো চুরি করার উদ্দেশ্য থেকে; চোরদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে – কোনো এক সময়ে কোনো একটি চোরের পরাজয়ের সাথে অপর সকল চোরদের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ অথবা পিতৃভূমির স্বার্থের সাথে একাত্ম এটি একটি অনৈতিক বুর্জোয়া মিথ্যাচার।"

The War and the Russian Social Democracy রচনায় লেনিন দেখিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিবাদমান জাতিগুলোর একটি জার্মানির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণী এবং শোষিত জনগণকে এটা বলে ধোঁকা দিচ্ছিল যে এই যুদ্ধ পিতৃভূমি রক্ষা, স্বাধীনতা এবং সভ্যতা, জারতন্ত্র থেকে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রকে ধ্বংস করার যুদ্ধ। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই বুর্জোয়ারা জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিপ্লবে স্বৈরাচারী জারকে সমর্থন করে। সত্যিকার অর্থে জার্মান বুর্জোয়ারা সার্বিয়াকে পদানত করতে চায় এবং দক্ষিণ স্লাভে এ জাতীয় বিপ্লব পরাস্ত করতে চায়। একই সময়ে তারা বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের মতো অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ধনী দেশগুলোতে সামরিক শক্তি পাঠাতে চায়। আসলে জার্মানি আত্মরক্ষার নামে যুদ্ধের কথা

বলে এমন সময়ে যুদ্ধ বেছে নিয়েছে যখন তার সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন বিধায় রাশিয়া এবং ফ্রান্সের পুর্বেই তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে।

অপর বিবাদমান জাতিসমূহের নেতৃত্বে ছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। এই দেশগুলোর বুর্জোয়ারা তাদের দেশের শ্রমজীবি এবং শোষিত জনসাধারণকে এই বলে বিভ্রান্ত করছে যে তারা আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা এবং সভ্যতার জন্য এবং জার্মানির সামরিকতন্ত্র ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সত্যিকার অর্থে এই বুর্জোয়ারা কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে সৈন্য ভাড়া করছে যারা ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও বর্বর এবং জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আসলে ব্রিটিশ এবং ফরাসি বুর্জোয়ারা জার্মানির উপনিবেশগুলি দখল করতে চায় এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে ধ্বংস করতে চায় যারা অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি অগ্রসর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে "অগ্রসর" "গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রগুলো বর্বর জারকে সহায়তা করছে পোল্যান্ড, ইউক্রেনকে ধ্বংস করার জন্য যাতে তারা রাশিয়ার বিপ্লবকে ভেঙে ফেলতে পারে।

লেনিন বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা নির্ণয় করা অসম্ভব যে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের দিক থেকে দুটি বিবদমান গ্রুপের মধ্যে কোনটি সমাজতন্ত্রের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। কিন্তু রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর জন্য সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে রাশিয়ার জার তার প্রলেতারিয়েতের মুক্তির সামনে প্রধান বাধা আর তাই জারতন্ত্রের পরাজয় রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর জন্য উত্তম। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পারাই তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার জন্য একমাত্র সঠিক স্লোগান ছিল। এই রূপান্তরকে যত কঠিনই মনে হোক না কেন সমাজতন্ত্রীরা কখনও তাদের সুশৃঙ্খল, স্থায়ী, অবিচলিত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যুদ্ধের বাস্তবতা মাথায় রেখে ছেড়ে যাবে না।

লেনিন বলছেন যে কেবলমাত্র এই পথেই সর্বহারাশ্রেণী জাত্যাভিমানী বুর্জোয়াদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমাতে পারবে এবং কোনো না কোনো ভাবে জাতির সত্যিকারের মুক্তি এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে লক্ষ্যভেদী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে জার্মানি-ইতালি-জাপান ফ্যাসিস্ট অক্ষ শক্তি পরাজয় শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়ই নয়, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে দুর্বল ও কোনঠাসা করে দিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনগুলিকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে দেয়। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কোনো উপনিবেশ বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি ঘটেনি। সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বল এবং কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার ফলেই উপনিবেশ ও আধা ঔপনিবেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনগুলি একের পর এক বিজয় লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেই চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম পরে সারা ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে শ্রমিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের শেষার্ধে যখন লাল ফৌজ রাশিয়ার বুক থেকে ফ্যাসিস্ট ফোর্সকে হটিয়ে দিয়ে জার্মানির দিকে অগ্রসর হয়, তখন পূর্ব ইউরোপের সমস্ত অধিকৃত দেশগুলির (occupied countries) যুদ্ধরত মুক্তিকামী মানুষের সাথে মিলিতভাবে ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দেয় এবং এসব দেশগুলিতে যেমন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ইত্যাদি ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে এদেশগুলিতে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পূর্ব জার্মানি ফ্যাসিবাদি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। পরিণাম স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবিরের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির গড়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বাজারের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বাজার গড়ে ওঠে। বিশ্ব দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বপরিস্থিতির এটি একটি মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন।

এই বিশ্বপরিস্থিতির বিপ্লবী তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যেমন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের প্রয়োজনে যুদ্ধ লাগানো বা তথাকথিত শান্তিরক্ষা করার একমাত্র নির্ণায়ক শক্তি ছিল, সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের আবির্ভাবের পর যুদ্ধ বা শান্তি রক্ষার প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও ততখানি

বর্তমান ছিল। শুধু তাই নয়, শান্তি শিবিরের সামরিক শক্তি, যা বহু ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সামরিক শক্তির থেকেও বেশি ছিল তার সাথে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন যা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও প্রবল হয়ে উঠেছিল তা মুক্ত হয়ে যুদ্ধের থেকে শান্তির শক্তিই বড় করে তুলেছিল। কিন্তু একথার অর্থ এ নয় যে, যুদ্ধের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং যত দিন সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে ইতিপূর্বে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে শুধুমাত্র সে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই নয়, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও মোকাবিলা করে বিজয় লাভ করতে হয়েছে, অন্য কোনো রাষ্ট্র পাশে দাঁড়ানোর মতো ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে অতি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের অবস্থানের জন্য দেশে দেশে বিপ্লব নিজের নিজের দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও হুমকির সম্মুখীন হয়ে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য পেয়েছিল। উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন ও সদ্যস্বাধীন বুর্জোয়া দেশগুলিও সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আধুনিক সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্র হস্তগত করে। এই চক্র ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তাঁর অথরিটিকে তথা লেনিনবাদের অথরিটিকে আঘাত করে। দলের সদস্য ও দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপযুক্ত চেতনার মান না থাকায় তারা বিপদ বুঝতে না পেরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘ ৩৪-৩৫ বছর ক্রুশ্চেভ থেকে গর্বাচেভ পর্যন্ত আধুনিক শোধনবাদীদের হাতে রাষ্ট্র ও দলের নেতৃত্ব থাকায় সোভিয়েতে নির্বিঘ্নে আধুনিক শোধনবাদের তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে বুর্জোয়া চিন্তা ও সংস্কৃতির চর্চা চলে এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার পরিণামে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক রাষ্ট্র ধীরে ধীরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতান্ত্রিক রাস্তা এবং সর্বহারা একনায়কত্ব থেকে বিচ্যুত হতে হতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অধঃপতিত হয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে পরাজিত যে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী শক্তি সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, বুর্জোয়া আদর্শগত আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং যে সম্পর্কে স্ট্যালিন মৃত্যুর পূর্বে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন, শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্র সেই প্রতিবিপ্লবের জমি প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই দেখিয়েছিলেন, আদর্শগত মান অনুন্নত থাকার ফলে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পার্টি নেতৃত্বের সাথে সোভিয়েত পার্টির সম্পর্ক ছিল যান্ত্রিক। অন্যরা সোভিয়েত নেতৃত্বকে অন্ধের মতো অনুসরণ করত। সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ছিলনা। সোভিয়েতে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার পর সেখানে আধুনিক সংশোধনবাদের চর্চা শুরু হয়, ফলে তার প্রভাব পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতেও ছড়ায় এবং বাড়তে থাকে। এর ফলে এই দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথাচাড়া দেয়। সোভিয়েতের গর্বাচেভ নেতৃত্বের সমর্থনেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সোভিয়েতের পূর্বেই প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয় এবং পুঁজিবাদের পুনঃস্থাপনা ঘটে।

রাশিয়ার পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়ে চীনে প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার জন্য মহান মাও-সে-তুঙ ঐতিহাসিক সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছু পর হুয়া গুয়াং ফেং-এর নেতৃত্বকে হটিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রতিবিপ্লবী দেং শিয়াং পিং চক্র দখল করে এবং চীনের পার্টি এবং রাষ্ট্রকে আধুনিক শোধনবাদের রাস্তায় পরিচালিত করতে থাকে। এরই পরিণতিতে সেখানেও প্রতিবিপ্লবের পথে পুঁজিবাদের পুনঃস্থাপনা ঘটেছে। এই প্রতিবিপ্লব অতি ধূর্ততার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির লেবেল লাগিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেভাবে সংঘটিত হয়েছে তাতে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে আজও চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলেই মনে করে। কিন্তু যেভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফা লাভের অধিকারকে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজির স্বার্থেই দেশকে পরিচালনা করে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, তাতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, চীনে নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে

ভিয়েতনামেও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। ফলত সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের অস্তিত্ব আজ আর নেই।

সোভিয়েত এবং চীনসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির (বা বাজারের) অবলুপ্তির ফলে বিশ্বপরিস্থিতির যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেটিও একটি মৌলিক পরিবর্তন।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য কি কি?

প্রথমত, বিশ্বপুঁজিবাদ আজ চূড়ান্ত সংকটের মধ্য দিয়ে চললেও এবং মরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীদের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বাধা দেবার মতো উপযুক্ত শক্তির অবর্তমানে যুদ্ধের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই যুদ্ধের অর্থ কেবল বিশ্বযুদ্ধই নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে লোকাল স্থানীয় যুদ্ধ, খণ্ড যুদ্ধ, আংশিক যুদ্ধ ইত্যাদি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব শান্তি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে আজ স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শক্তিই নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও মোকাবিলা করে জয়লাভ করতে হবে। স্বভাবতই, বিপ্লব সংগঠিত ও সফল করা পূর্বের তুলনায় কঠিন হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লেনিন এবং স্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদ মরণাপন্ন এবং সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও তার একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্ট্যালিন দেখান যে পুঁজিবাদ সেই আপেক্ষিক স্থায়িত্বও হারিয়ে বসেছে। যুদ্ধ শেষে উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের বাজার হারিয়েছে শুধু নয়, এসব নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি সংকুচিত বিশ্ববাজারে নয়া প্রতিযোগী হয়ে আসতে থাকায় বাজার সংকট আরও বৃদ্ধি পায়। যা দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদের সংকট এখন এবেলা-ওবেলার সংকটে পরিণত হয়েছে।

পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক মালিকানা এবং ক্রমবর্ধমান বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উভয় প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশ ঘটানো হচ্ছিল। ঐসব দেশে পুনরায় পুঁজিবাদ ফিরে আসার ফলে আবার মালিক-মজুর সম্পর্ক এবং অধিকতম মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন হওয়ার ফলে শ্রমিক এবং জনসাধারণের শোষণ চলছে এবং তারই ফলে বাজার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে এবং অবস্থিত উৎপাদিকা শক্তিকে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী দুনিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে কিন্তু এত সংকট নিয়ে যুক্ত হয়েছে যে এর ফলে পুঁজিবাদী সংকট হ্রাস তো পায়ইনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাজার দখলের প্রতিযোগিতা যেমন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হচ্ছে তেমনই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে বিকাশশীল এবং পিছিয়ে পড়া দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলিরও হচ্ছে।

বিশ্বায়ন নয়া উপনিবেশিক শোষণের মহাপরিকল্পনা

বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে পুর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেমন পূর্বতন সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর গঠন এবং বিশ্বায়ন বা মুক্ত বাজারের পরিকল্পনা রূপায়ন।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অতি দক্ষতার সাথে এই বিশ্বায়নের নীতি প্রণয়ন এবং অতি ধূর্ততার সাথে তাকে কার্যকর করেছে। বিশ্বায়ন নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ। নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মূল চরিত্র উদঘাটন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুপূর্বেই দেখিয়েছেন, "It is exploitation without direct rule over the colony, this is the new method of colonialism." *(Call of the Hour, SW-Vol-II, P. 48)* অর্থাৎ, "প্রত্যক্ষ শাসন ব্যতিরেকে ঔপনিবেশিক শোষণ – এটাই উপনিবেশবাদের নয়া পদ্ধতি।"

নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ দেখে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেন, কোনও স্বাধীন বুর্জোয়া দেশে শক্তিশালী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রবেশ ও ব্যাপ্তি ঘটলে সেই দেশের

রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না। এই বিভ্রান্তি কাটাতেই লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' রচনায় বলেছিলেন : "Finance capital is such a great, it may be said, such a decisive force in all economic and in all international relations, that is capable of subjecting and actually does subject to itself even state enjoying the fullest political independence." (সকল আর্থিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফিনান্স পুঁজি এতই বিরাট বা বলা যায় এমনই অমোঘ শক্তিধর যে তা এমনকী রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকেও নিজের অধীনস্ত করতে পারে এবং বাস্তবে তা করেও"। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় পুঁজিবাদের প্রাক সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যত দূর রক্ষিত হত, সাম্রাজ্যবাদের যুগে কোনো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশের পক্ষে সেটা বজায় রাখা পূর্বের মতো সম্ভব নয়।

বিশ্বায়নের পথ বেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ (Privatization), উদারিকরণ (Liberalization)-এর নীতি এসেছে এবং তারই পথ বেয়ে TRIPS, TRIMS, FIIS এবং FDI ইত্যাদি দুর্বল এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতেই শুধু নয়, বিকাশমান দেশগুলিতেও চালু হচ্ছে এবং এসব দেশের অর্থনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর এই পথেই IMF (International Monetary Fund), World Bank, ADB (Asian Development Bank) – এসব সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ঋণের হাতিয়ার ব্যবহার করে পিছিয়ে পড়া দুর্বল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের বাজার করে তুলেছে। ফলত পিছিয়ে পড়া এবং বিকাশমান দেশগুলির সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, শুধু তাই নয়, এ দ্বন্দ্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সামরিক শক্তিও বাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু এই পথেও বিশ্ব পুঁজিবাদ বাজার সংকটের সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৮ সালে আমেরিকায় লেহম্যান ব্রাদার্সে'র দেউলিয়া ঘোষণা থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদী আর্থিক সংকট যে তীব্র রূপ নিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত তার অবসান ঘটেনি। মন্দার আঘাত থেকে আমেরিকা-ইউরোপ ও এশিয়ার তাবড় তাবড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পরিত্রাণের পথ পাচ্ছেনা। 'মন্দ কাটছে' বলে মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হলেও, বাস্তবে অর্থনীতি সামান্য চাঙ্গা হচ্ছে তো পরমুহূর্তে পাঁকে ডুবছে।

বিশ্ব অর্থনীতির এই সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সংকট। ২০০৭-'০৮ সালে এই সংকটের বিস্ফোরণ ঘটেছিল ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দেউলিয়া হবার মধ্য দিয়ে। সুদ ও ফাটকার কারবারে এরা দেদার ঋণ দিয়েছিল, ফেরতের গ্যারান্টি না রেখেই। ঋণের বাজারে বুদ্বুদ যখন ফাটল, তা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ও ব্যাংকগুলির দেউলিয়া ঘোষণায় এবং শিল্প সংস্থা বা কোম্পানিগুলোর আর্থিক সংকটে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র ও সরকার এগিয়ে আসে 'ত্রাণ প্যাকেজ' নিয়ে এদের বাঁচাতে। বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারি তহবিল থেকে দেয়া হয়। এইভাবে যা ছিল ব্যাংক ও বিভিন্ন কোম্পানির ঋণ সংকট তা পরিণত হলো রাষ্ট্রীয় বা সরকারি আর্থিক সংকটে, সরকারি ঋণের পরিমাণ বিপুল বৃদ্ধি পেল। পরিণামে আর এক ধরনের সংকট শুরু হলো। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশে দেশে শাসকশ্রেণি যে পথ নিল তা হল, সরাকারি ব্যয় সংকোচ ও কোম্পানির ব্যয় সংকোচন।

ফলে শ্রমজীবী মানুষের শোষণ আরও তীব্র হলো, মজুরি হ্রাস, ছাঁটাইয়ের সাথে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য প্রভৃতি খাতে সরকারি আর্থিক সহায়তা ছাঁটাই করা হলো। শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি আক্রান্ত হলো। কিন্তু এই পথে পুঁজিবাদ মন্দার সংকট থেকে পরিত্রাণ তো পাচ্ছেই না, বরং ক্রয়ক্ষমতার উপর এই আক্রমণ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর বাজার সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, সেটাও কেবল মার্কিন অর্থনীতির দেখানো হিসাব এবং তাও সামান্য ও সাময়িক মাত্র। ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় বাজার তেজি হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদন শিল্পগুলির অবস্থা ভাল নয়। রাষ্ট্র সংঘের ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির ২০১৪ সালের রিপোর্টে দেখা গেছে ২০১২ ও ২০১৩ এই দু'বছরই বিশ্ব অর্থনীতি মাত্র ২.৩ শতাংশ হারে বেড়েছে। অবস্থা আগামী দিনে ভালো হওয়ার কোনো আশ্বাস বা ইঙ্গিত সেখানে নেই।

বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ক্রমাগত হ্রাসের পিছনে পুঁজিবাদী বাজার সংকট অন্যতম কারণ। মন্দাজনিত বাজার সংকট উৎপাদন শিল্পে শ্লথতা এনেছে, ফলে তেলের চাহিদা কমেছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার নিজস্ব তেল উৎপাদন এবং তেলের অন্য একটি উৎস, যা 'শেল গ্যাস' নামে পরিচিত, তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরব তেল উৎপাদন কমাতে নারাজ হওয়ায় বাজারে তেলের সরবরাহ বিপুল। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় তেল রপ্তানিকারী দেশ রাশিয়া, ইরান ও ভেনিজুয়েলার রপ্তানি আয় মার খেয়েছে। এর পরিণামে ও অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেনসহ বিরাট অঞ্চলব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

বিশ্বায়নের অংশ হিসাবে বেসরকারিকরণ-উদারীকরণের, যা নয়া উদারবাদ নামে অভিহিত হয়েছে, তা বিশ্বে নিদারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। 'অক্সাম'-এর রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেকের মালিক হচ্ছে জনসংখ্যার ১ শতাংশ মাত্র। এই এক শতাংশ সর্বোচ্চ ধনীদের মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ১১০ লক্ষ কোটি ডলার। এটা জনসংখ্যার সর্বনিম্নস্তরে হাতে থাকা জনগণের সম্পদের চেয়ে ৬৫ গুণ বেশি। অপর একটি রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশের সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি। গত ৩০ বছরে সকল পুঁজিবাদী দেশে ধনী ও গরিবের ব্যবধান শিখরে পৌঁছেছে। এই পর্যায়ে শ্রমিক শোষণ বেড়েছে চূড়ান্ত হারে, পাশাপাশি সরকারি ব্যয় ছাঁটাইয়ের কোপ পড়েছে শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রায়-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যে। ফলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা, ক্রমাগত কমছে।

এ সবের পরিণামে পুঁজিবাদী বাজারে মন্দা আরও ঘনীভূত হচ্ছে, অতি উৎপাদনের সংকট তীব্র হচ্ছে। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ। মুনাফার হার সর্বোচ্চ রাখার জন্য ক্রমাগত উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পুঁজিপতিশ্রেণী নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে উৎপাদনে, যা শ্রমিককে উদ্বৃত্ত করে দিয়ে ছাঁটাইয়ে ঠেলে দিচ্ছে। এই শ্রমিকরাই তো বাজারের ক্রেতা। কর্মহীন, আয়হীন বা সামান্য আয়ের শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ বাজারে ক্রেতার অভাবেরও বৃদ্ধি। অর্থাৎ বাজার সংকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' রচনায় এবং ১৯৫২ সালে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড স্ট্যালিন বলেছিলেন, শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বাজারসংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোগ্যপণ্যে বাজার সংকুচিত হওয়ায় বিকল্প হিসাবে সামরিক অস্ত্রের বাজার সৃষ্টি, যেখানে ক্রেতা হচ্ছে স্বয়ং রাষ্ট্র, কিন্তু এর পরিণামে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি জনিত সংকট বাড়তে থাকে। ১৯তম কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড স্ট্যালিন বলেন, "The militarisation of the national economy does not remove, but on the contrary, widens the gap between production potentialities and the declining effective demand of population." (উৎপাদন করতে পারার ক্ষমতা আর জনগণের ক্রমহ্রাসমান কার্যকরী চাহিদা, এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, অর্থনীতির সামরিকীকরণ সেই ব্যবধানকে দূর করতে পারেনা, বরং তাকে আরও বাড়ায়) অর্থাৎ সামরিকীকরণ বাজার সমস্যার সমাধান করার বদলে সংকটকে আরও বাড়াচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ পরে দেখান, শুধু শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিই নয়, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোও বাজার সংকটের সামনে পড়ে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। কৃত্রিম বাজার তৈরির উপায় হিসাবে সামরিক অর্থনীতি বা যুদ্ধ অর্থনীতি ও অস্ত্র ব্যবসায় কোনো খামতি নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রতিটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশই এই পথে হাঁটছে। শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে অর্থনীতির সামরিকীকরণ আরও ব্যাপক রূপ নিয়েছে, সামরিক উৎপাদন বিপুল হয়েছে, তবুও পুঁজিবাদ আজ প্রকৃতই কানাগলিতে, সামনে পরিত্রাণের পথ নেই।

মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে প্রকৃতিতে নতুন যাই আসে তা বৃদ্ধি পায় ও বিকশিত হয়। আর বিকাশের পথে একদিন নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তাকে চলে যেতে হয়। সমাজজীবনেও যেকোনো নতুন ব্যবস্থা প্রথমদিকে প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক থাকে, কিন্তু পরে সেটা থাকে না, বরং মরণাপন্ন হয়ে পড়ে এবং তাকে চলে যেতে হয়। পুঁজিবাদ একদিন ছিল না, এসেছে। প্রথমদিকে সে বিপ্লবী ছিল – কিন্তু তার চূড়ান্ত বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে যখন সে সংকটগ্রস্ত এবং মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে, তখন তাকে যেতেই হবে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এও দেখিয়েছে যে প্রকৃতিতে যেমন পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই আসে সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধঁঃড়সধঃরড়হ

(স্বয়ংক্রিয়তা) কাজ করে না। এখানে মানুষের চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মানুষের চেতনা গুণগত পরিবর্তনের গতিকে হয় ত্বরান্বিত করে না হয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কিছুদিন পূর্বে গ্রিস থেকে শুরু করে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন সমস্ত ইউরোপকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকাতে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, প্রায় একই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে তিউনিশিয়া থেকে শুরু হয়ে মিশর ও অন্যান্য দেশে বিশাল গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল। এইসব আন্দোলনগুলির আশু কারণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে মূল কারণ একই। তা পুঁজিবাদী শোষণ ও অপশাসন। এই আন্দোলনগুলি এমন বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল যে, তা এমনকী সমাজের মৌলিক পরিবর্তন বা বিপ্লবী পরিবর্তনও আনতে পারত। কিন্তু তা ঘটেনি, আন্দোলনগুলি তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারেনি। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলি থেকে অনেকে এ ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগঠিত নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব ও বিপ্লবী লাইন না থাকার জন্য এ সকল আন্দোলনগুলির শুধু ব্যর্থতাই ঘটেনি, অনেকগুলি আন্দোলন, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে, মৌলবাদীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে গেছে। আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করতে সাম্রাজ্যবাদী চক্র শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী শক্তিকে লেলিয়ে দিয়েছে। লেনিনের শিক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং বিপ্লবী দলের অভাবের জন্যই ওইসব সম্ভাবনাময় আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারল না।

সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের নামে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

বিগত দুই দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে অস্ত্র, অর্থ ও রাজনৈতিক মদত দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে, আবার তাকেই অজুহাত করে নানা দেশে হামলা ও আক্রমণ চালাচ্ছে, গণতান্ত্রিক চিন্তা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করাচ্ছে; মধ্যযুগীয় চিন্তা, আচরণ ও জীবনযাত্রাকে ফিরিয়ে আনছে। এটা তারা করতে পারছে সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অনুপস্থিতির ফলে। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র এবং তাদের প্রভাবাধীন রাষ্ট্রসমূহকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সৃষ্টি করেছে অথবা তাদের সহায়তা দিয়েছে, তার একটি নজির আফগানিস্তান। পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জন্ম হয় তালেবান সন্ত্রাসীদের। আফগানিস্তানে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোহাম্মাদ নাজিবুল্লাহ সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী-মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সামরিক সাহায্য দেয়। কিন্তু নজিবুল্লাহ সরকারকে রক্ষা করা যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সামরিক সমর্থনে মুজাহিদরা ওই সরকার উৎখাত করে ক্ষমতাসীন হয়। এদেরই একটি অংশ তালেবান নাম নিয়ে ক্রিয়াশীল হয় এবং মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে পরবর্তীতে মুজাহিদদের উৎখাত করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। প্রথমে সৌদি আরব এবং পরবর্তীতে সুদান থেকে বিতাড়িত হয়ে আফগানিস্তানের তালেবান রাজ্যে ওসামা-বিন-লাদেন আশ্রয় পেয়েছিল। তালেবানদের সাহায্যে ওসামা-বিন-লাদেন আফগানিস্তানে তার মিলিশিয়া শক্তি আল-কায়েদা সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে নব্বই এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে। ফলে যে প্রয়োজন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদীরা এ সকল মৌলবাদী সংগঠনসমূহকে সমর্থন যুগিয়েছে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। বরং এর মধ্যেই তালেবান, আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন জঙ্গীবাদী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব নিয়মে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। যেমন আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তালেবানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অস্ত্র সহায়তা দিয়েছিল তা যেমন হিংস্র মারণাস্ত্র তেমনি আধুনিক। তালেবানদের হাতে সেসকল অস্ত্র থেকে যায়। অস্ত্র যেহেতু একটি শক্তি তাই স্বার্থের বিরোধ ঘটলে যে একসময় অস্ত্র দিয়েছিল তার বিরুদ্ধেও সে তা ব্যবহারের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এসকল জঙ্গী সংগঠনগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব প্রভৃতির মদতে বেড়ে উঠে পরবর্তীতে তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এসকল মৌলবাদী সন্ত্রাসী শক্তিগুলির হুমকির মুখে এদের শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়। এর অজুহাতে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় যা ধর্মীয় মৌলবাদীদের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াতেই সাহায্য করেছে। অন্যদিকে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব জনমত অগ্রাহ্য করে মারণাস্ত্র নির্মাণের মিথ্যা অজুহাত তুলে আসলে মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্র দখল করার জন্য ইরাকে ভয়ানক আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংস ও লক্ষ লক্ষ

মানুষকে হত্যা করেছে। ন্যাটোকে সামনে রেখে লিবিয়া দখল করা হয়, পরে সিরিয়ারও আক্রান্ত হয়। বর্তমানে সিরিয়ায় আইএসআইএল নামের একটি সংগঠন সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে আরও ফ্যাসিবাদী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এরা প্রধানত সুন্নী সম্প্রদায় হওয়ায় শিয়া অধ্যুষিত ইরান ও সিরিয়া এবং পরবর্তীতে ইরাকে নুরে-আল-মালিকীও শিয়া সম্প্রদায় হওয়ায় এদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আইএস কাজ করছে। কিন্তু সমগ্র আরব জুড়ে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় আরবের রাজতন্ত্রগুলোও হুমকি অনুভব করছে। ফলে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে আইএস এর কার্যক্রমের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের সুর এবং অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার আগ্রাসী পরিকল্পনার পরিণামে সেখানে আজ সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় উন্মাদনা ও বর্বরতা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার দেশগুলোর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানেও সাম্রাজ্যবাদীদের একই ছক দেখতে পাওয়া যায়। যখনই কোনো একটি দেশ নিজেদের জাতীয় সম্পদ নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, তখনই ওইসব দেশের ভিতরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা, গোষ্ঠী সংঘর্ষ লাগিয়ে দেয়া, সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ চালানো এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা প্রভৃতি নানা কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। এর পরিণামেই ঘানা, গিনি-বিসাউ, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, সোমালিয়াসহ আফ্রিকার নানা দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সুদানও একই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত। সাম্রাজ্যবাদীরা সুদানে এনজিও এবং দাতা সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে, সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ব্যবহার করে পুলিশি কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা, মধ্য অফ্রিকান প্রজাতন্ত্র এবং কঙ্গোতে সীমিত আকারে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছে, মার্কিন বিমান বাহিনী দক্ষিণ ইথিওপিয়া ও জিবুতিতে ড্রোন মহড়া চালাচ্ছে সোমালিয়ার মিলিশিয়া আল-শাবাব ও ইয়েমেনের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানার জন্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট হয়ে ইসরাইল প্যালেস্টাইনে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

একদিকে মার্কিন আধিপত্যের সাথে দ্বন্দ্বের পাল্টা হিসেবে সমগ্র ইউরোপকে যুক্ত করে এবং অন্যদিকে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর উপর আরও শোষণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটি সাম্রাজ্যবাদী জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ন্যাটো জোট গঠনের মধ্য দিয়ে আমেরিকা ইউরোপেও যে সামরিক আধিপত্য কায়েম করেছে, তার বাইরে গিয়ে ইউরোপের নিজস্ব সামরিক শক্তি গড়বার আকাঙ্ক্ষা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর থাকলেও তাকে তারা আপাতত বাস্তবায়ন করেনি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নামে ইউরোপের দেশগুলির সম্মিলিত জোট হলেও এবং সকল ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থেই এই উদ্যোগ– এই ঘোষণা দিলেও বাস্তবে এখানেও সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির আধিপত্য কায়েম হয়েছে পুঁজির শক্তির জোরে। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির তীব্র দ্বন্দ্ব চলছে। কেউ কেউ ইউনিয়ন ছেড়ে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে।

আজ সকল পুঁজিবাদী দেশই ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকছে

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন বিকশিত (advanced) এবং বিকাশশীল (developing) সকল পুঁজিবাদী দেশই আজ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে বাধ্য। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের (administrative facism) জন্ম হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আধ্যাত্মবাদ আর কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের সংস্কৃতিগত ভিত্তি তৈরি করা হয়। তাঁর ভাষায়, "একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রশাসনের উগ্র মূর্তিটাকেই ফ্যাসিবাদ বলেন, একনায়কত্বকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। মনে রাখা দরকার একনায়কত্ব – মিলিটারি একনায়কত্ব হয়, একনায়কত্ব 'ক্যু'র (আচমকা অভ্যুত্থানের) দ্বারাও তৈরী হয়। তাছাড়া, অত্যাচার সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থাতেই হয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা করে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ তার চেয়ে দুর্ধর্ষ। শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, অর্থাৎ দেশে একদল টেকনোক্র্যাট (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে – যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ...। অপরদিকে যত আধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে।

ফ্যাসিবাদ হচ্ছে আধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।" (ফ্যাসিবাদ ও বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট; শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড) এই ধরনের একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র যদি অধিকাংশ মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত করে রাষ্ট্রের পিছনে দাঁড় করাতে পারে তাহলেই পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়।

ইতালির কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট শাসক বেনিতো মুসোলিনী বলেছিল, "Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power." অর্থাৎ "ফ্যাসিবাদকে আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কর্পোরেটবাদ বলা যায় কারণ এটি হল রাষ্ট্রের সাথে কর্পোরেট শক্তির মিলিত রূপ।"

একটি দেশ যখন ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যসম্বলিত হয় তখন সে দেশটিতে প্রবল ধর্মান্ধতা, উগ্র জাত্যাভিমান, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাত-পাত-ধর্ম-মতাদর্শগত উগ্র বিরোধ বাঁধানো, সামরিক বাহিনীর আধিপত্য শক্তিশালী করা, নারী নিগ্রহ, প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, জনগণের মাঝে জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে কাল্পনিক ভীতি সৃষ্টি, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মকে অনুসঙ্গ করা, কর্পোরেট শক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান, শ্রমশক্তিকে অবদমন, শিল্প এবং বাক স্বাধীনতা হরণ, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে অপরিসীম ক্ষমতা প্রদান, স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব, ভুয়া বা অকার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিরাজ করে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন ভারতসহ আমাদের ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশ অর্থাৎ উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত প্রতিটি দেশে ফ্যাসিবাদ আজ প্রধান রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করছে।

চীন যদিও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের দাবি করে কিন্তু পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর চীনও ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে।

আজকের যুগের কর্পোরেট হাউজগুলোর অর্থে পালিত গণতন্ত্র এবং তার প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় ঠাঁট বাট বজায় রেখে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন যা চলছিল কোনও কোনও অনুন্নত দেশে আজ আর তাও বজায় রেখে চলতে পারছে না। সুযোগ ও সুবিধামতো একদলীয় দুঃশাসন চাপিয়ে দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু তা হিটলার বা মুসোলিনীর মতো সরাসরি ঘোষিত না হয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে, গণতন্ত্রের মুখোস পরে করা হচ্ছে, তাই এর বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ থাকলেও তা আন্দোলনরূপে দানা বাঁধতে পারছে না। শোষিত জনগণকে সচেতনভাবে আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত করে আন্দোলনে একত্রিত করতে পারলেই ফ্যাসিবাদকে রোখা সম্ভব।

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মানব ও মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধযজ্ঞ

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী বিশ্বে সম্প্রসারণবাদ, দখলদারিত্ব এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ভয়াবহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের তুলনায় মারাত্মক তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উৎপাদন যুদ্ধাস্ত্র, কিন্তু অস্ত্রশক্তি পুঁজিবাদী রাশিয়ারও কম নয়। সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেও পূর্বতন সোভিয়েতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তিকে ব্যবহার করে রাশিয়া ক্রমাগত পুঁজিবাদী মজবুত করেছে। সত্তরের দশকে মতাদর্শগত বিরোধের কারণে সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক চীনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন থাকা সত্ত্বেও হালে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে এবং সাধারণ শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে গিয়ে পুঁজিবাদী চীন এবং পুঁজিবাদী রাশিয়ার মধ্যে একটি নতুন সখ্যতা গড়ে উঠেছে। রাশিয়া এবং চীন দু'টি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। ইতিমধ্যে চীন অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে বর্তমানে পৃথিবীতে দুই নম্বর। একারণে রাশিয়া এবং চীনের মধ্যকার বোঝাপড়া বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারার মতো। এরা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে মার্কিন আধিপত্যের পাল্টা হিসাবে। এদিকে আবার ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে ঐতিহ্যগতভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আবার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে ভারত দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও ভারতকে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ইসরাইলের সাথে যুক্ত করে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার আধিপত্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখতে অগ্রসর হয়েছে। এদের মৈত্রীর মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করছে বলেই ভারত আবার 'ব্রিকস' জোটেও শরীক হয়েছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদী

পরিকল্পনা প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাছে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ ব্রাজিল, যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিরোধ রয়েছে। ব্রাজিল ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয় থেকে বের করতে চায়। ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি মার্কিনি আধিপত্য থেকে বের হয়ে নিজস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বিকশিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদেশগুলির মধ্যে আবার ব্রাজিল অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা। সমাজতান্ত্রিক কিউবা স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এর ফলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে অলিখিতভাবে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মিলিত অবস্থান গড়ে উঠেছে। আবার আফ্রিকা মহাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি তুলনামূলক শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ। মিলিতভাবে ভারত, রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্বে উল্লেখিত 'ব্রিকস' (BRICS) জোট গড়ে তুলেছে। ব্রিকস ৩০০ কোটি মানুষের আবাসস্থল যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪০%। ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর জিডিপি ১৬.০৩৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের মোট জিডিপির ২৯% এবং সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির শতকরা ১৮ ভাগ। এইভাবে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলি বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাববিস্তারকারী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

বর্তমানে ইউরোপের ২৮টি দেশ ইউরোপিয় ইউনিয়নের আওতাভুক্ত। জার্মানি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে ইউরোপে কর্তৃত্ব কায়েম করতে না পারলেও বর্তমানে অর্থনৈতিক শক্তির জোরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষে আছে। প্রতিবিপ্লবের পর পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানে পৃথক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থিত যে দেশগুলি, সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য কায়েম করেছে। কিন্তু রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকে সংহত করে, রুশ পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করে এইসব দেশে আধিপত্য কায়েমে অগ্রসর হয়েছে। ইউক্রেন নিয়ে মার্কিন-রাশিয়া বিরোধ চরমে উঠেছে, আমেরিকা এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছে। অর্থাৎ, এইসব দুর্বল দেশগুলির বাজার কারা লুট করবে, সস্তা শ্রমশক্তিকে কারা শোষণ করবে, এই নিয়ে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তার সহযোগী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অন্যদিকে পুঁজিবাদী রাশিয়ার সংঘাত তীব্র হচ্ছে।

বর্তমান পুঁজিবাদী রাশিয়া দাবি করছে যে, তাদের সাথে মার্কিন শাসকদের একটি সাধারণ বোঝাপড়া ছিল যে, পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে ন্যাটোভুক্ত করা হবে না। কিন্তু, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা তা মানবে কেন? এই সকল দেশগুলো একের পর এক ন্যাটোভুক্ত হওয়ায় রাশিয়া নিজের অস্তিত্ব ও প্রভাব বলয় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিপন্ন বোধ করেছে। এর মধ্যে ইউক্রেন এর অবস্থান কিছুটা ভিন্ন ছিল। ইউক্রেন ন্যাটোভুক্ত না হয়ে বরং একটি বাফার রাষ্ট্র হিসাবে বজায় ছিল। কিন্ত যখন ইউক্রেনের নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকার দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকেও ন্যাটোভুক্ত করতে চাইলো এবং সেই সরকার দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল, তখন রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করলো। ক্রিমিয়া যদিও একদা রাশিয়ারই একটি অংশ ছিল। ক্রিমিয়ার জনগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রাশিয়ান আর অল্প কিছু ইউক্রেনিয়ান এবং ক্রিমিয়ান তাতার। ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সেভাস্টপল কার্যত রাশিয়ারই বন্দর। ক্রিমিয়ার এই নৌঘাঁটির মাধ্যমে রাশিয়া বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করত। ক্রিমিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে নৌ পথে যোগাযোগের জন্য রাশিয়ার আর কোন উপায় থাকবে না। ইউরোপে এবং সমগ্র বিশ্বে অস্ত্রের শক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাশিয়া একটি বিশাল বাধা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাশিয়াকে কাবু করার জন্য চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলতে উদ্যত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে ফেলল। এই বিরোধের তীব্রতা এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। এ দুটি পরাশক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদ ডেকে আনছে।

সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

একচেটিয়া পুঁজির কায়েমী স্বার্থকে নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নামিয়ে এনেছে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে সাম্রাজ্যবাদ এককেন্দ্রিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো একটি কেন্দ্রীভূত সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তুলতে চাইছে।

এ সাংস্কৃতিক বলয় কেন্দ্রীভূত হলে মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করা সহজ হবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে আজকের দিনে যে সকল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল সহিংসতা এবং যৌনতা। এ দুটি থাকলে মানুষের পক্ষে সুস্থভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল যখন সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারাও মানুষের চরিত্রের উপর মনুষ্যত্ব ও উচ্চ মানবিকতার ছাপ পড়ত। মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা পেত। বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, শিল্প যখনই সামাজিক উদ্দেশ্যমুখিনতা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক বিনোদনের বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে তখনই শিল্প মার খেয়েছে। রেনেসাঁর যুগে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির যে অভাবিত বিকাশ ঘটেছিল যা সামন্তীয় অচলায়তনকে সমাজ থেকে উৎপাটিত করতে সহায়তা করেছিল, তার স্রষ্টা যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ভবিষ্যতের একটি নতুন ব্যবস্থার স্থপতি বা স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁদের শিল্প নির্মাণ তাঁদের লড়াইয়ের অংশ ছিল। তাঁরা শিল্প বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করার কথা কখনও ভাবেন নি। বরঞ্চ শিল্পের স্রষ্টাকে হয়ত গিলোটিনে মাথা পেতে দিতে হত। বিশ্ববরেণ্য লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। একই সাথে তিনি ছিলেন প্রকৌশলী ও চিকিৎসক। এর তালিকা বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

এঁরা আমাদের পূর্ব পুরুষ, আমাদের সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা থেকে একে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ আমরা ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত। এ আক্রমণ যে কোনো ধ্বংসাত্মক জীবাণু বোমার থেকেও মারাত্মক। আজ পাশ্চাত্যে এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ধ্রুপদী সংস্কৃতির সমঝদার কোনো ব্যক্তিকে অপ্রকৃতস্থ হিসাবে গণ্য করার। ধ্রুপদী সংস্কৃতির উপকরণগুলোকে সম্পূর্ণ দুর্লভ করে তোলা হচ্ছে। এরপরও যারা সেটা আঁকড়ে থাকতে চায় তাতে সে যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতায় পড়ে তা অসহনীয়। এর উপর রয়েছে শিল্পকে একটা বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে একে পণ্যে পরিণত করা। এখন শিল্পের সকল উপকরণই বাজারি পণ্য। বিক্রি করে মুনাফা হলে কদর আছে আর না হলে তা পরিত্যজ্য। এদিকে আবার খুবই সুপরিকল্পিতভাবে নোংরা সংস্কৃতির দর্শক সৃষ্টি করছে অধঃপতিত বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম বিরামহীনভাবে। সে প্রতি মুহূর্তে বিরামহীনভাবে অধঃপতিত সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদের কবলে উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়, ফলে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বোধ-চেতনা ধারণে তারা অসমর্থ হয়। সে অবস্থায় বিনোদনের নামে অধঃপতিত নাচ, গান, নাটক, সিনেমা প্রভৃতিতে সহজেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে গোটা সমাজের নৈতিকতায় ধস নামে। এর ফলে সর্বাপেক্ষা আক্রান্ত হয় নারী, শিশুসহ সমাজের দুর্বল শ্রেণী। মানুষে মানুষে দায়বদ্ধতা একটি তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়। সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকালে সর্বত্র আমরা এই সংকট দেখতে পাই। এক্ষেত্রে উন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

নতুন নতুন নামে নানা সময়ে যেসব বুর্জোয়া মতবাদ সমাজে জন্ম নেয়, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাদের সকলের উদ্দেশ্যই হলো মার্কসবাদকে আক্রমণ করা, বুর্জোয়াদের পক্ষে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। পোস্ট মডার্নিজম বা উত্তরাধুনিকতা এরকমই এক মতবাদ। সোভিয়েত পার্টি যে সময় সংশোধনবাদের কবলে পড়ল সেই সময়ে এর জন্ম। '৬০ এর দশকে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত আলতুসার, জাঁক দেরিদা, মিশেল ফুকো এবং ইউরোপের আরও কিছু মানুষ হাঙ্গেরির প্রতিবিপ্লব দমনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতার ঘটনায় খুব বিক্ষুব্ধ হন। এদের মাথা ঘুরে যায় হাঙ্গেরির প্রতিবিপ্লবীদের মুখে 'গণতন্ত্র' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র স্লোগান শুনে। এদের দর্শনগত সমস্যা ছিল যে, এরা ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণাকে absolute করে ফেলেছিলেন।

যে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বুর্জোয়া ধারণার জন্ম দিয়েছিল, ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে প্রগতির সূচনা করেছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে, সেই বুর্জোয়াশ্রেণীই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে সামাজিক দায়বদ্ধতাহীন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার জন্ম দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিসম্পত্তিকে শাশ্বত করে ফেলল।

আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণাগুলো চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও আত্মসর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে। তাই আজকের যুগে যথার্থ ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণা এবং ব্যক্তি স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তির স্বার্থকে একাত্ম করে দেওয়ার সংগ্রাম চালানো। একথা পোস্ট মডার্নিস্টরা ধরতে পারেননি বলেই

ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে তারা উগ্র স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছেন। এই উগ্র ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা থেকেই এসেছে অস্তিত্ববাদ, সমকামিতা, ফেমিনিজম প্রভৃতি চিন্তাসমূহ।

বস্তুজগতে প্রত্যেকটি ঘটনা যে পরস্পর সম্পর্কিত তা পোস্ট মডার্নিজমে স্বীকার করা হয়না। এই চিন্তার বাহকরা প্রত্যেকটি ঘটনার আলাদা আলাদা কারণ খুঁজতে যান। তারা সামগ্রিকতাকে অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনাকে সামগ্রিকতায় বিচার করার প্রয়োজন স্বীকার করেন না। এই চিন্তার ছাপ পড়েছে তাদের চিন্তাবাহীদের দ্বারা রচিত বা নির্মিত সাহিত্য, সঙ্গীত, আর্কিটেকচার, চিত্রকলা, বিজ্ঞানসহ শিল্প ও জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখায়। সাহিত্যে আওয়াজ তোলা হয়েছে, উপন্যাসের ফর্মকে ভেঙ্গে দাও। সংগীতেও তেমনি। রক ও পপ মিউজিকের নামে চলছে সংগীতের কাঠামোর যথেচ্ছ ভাঙ্গন। এমন চিন্তা তরুণ প্রজন্মের মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কোনও চিন্তা বা ধারণা মানুষের আবেগ, সংবেদনশীলতাকে নাড়িয়ে কোনো লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে গেলে তা একভাবে দাসত্ব বরণ হয়ে যায়। তরুণদের মগজে এ ধরনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের আরও বেশি করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাস বানানোর আয়োজন করা হচ্ছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে ইউরোপে যে নারী জাগরণের স্লোগান উঠেছিল, তার থেকে আজকের নারীবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। এটিও ব্যক্তিস্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণাকে শাশ্বত করতে গিয়ে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের কথা বলে একদল নারী এমন সকল দাবি তুলেছে যা সমাজের প্রতি দায়িত্বহীনতারই প্রকাশ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যেসব অন্যায় সুযোগ সুবিধা চাইলে ভোগ করতে পারে, যা তাদের পদে পদে ছোট করে, নারীর জন্য সেই সুবিধাগুলো আদায়কেই তারা নারী স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করলেন। তারা যে ঐতিহাসিক কারণে নারী পুরুষের অধীনস্ত হয়েছিল তা অস্বীকার করলেন, সেগুলো উৎপাটনের সংগ্রামের পরিবর্তে নারীদের এই পরিস্থিতির জন্য গোটা পুরুষজাতিকেই দায়ী করে বসলেন।

একইভাবে যৌন স্বাধীনতার কথা বলে সমকামিতার স্বীকৃতির দাবি উঠেছে। যৌনতা যে নিছক সম্ভোগের ব্যাপার নয়, তার সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রুচি-সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে তা তারা মানতে নারাজ। তারা যৌনতার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধবর্জিত নির্বিচার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যেটা যথেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এরকম দায়হীন স্বাধীনতার চিন্তা তাদের বিকৃতির দিকে নিয়ে যাবেই ও গেছেও।

আধুনিক সংশোধনবাদ প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান
মার্কসবাদে অমূল্য সংযোজন

মার্কসবাদের শুরু থেকেই শোধনবাদ ও গোঁড়ামি, মার্কসবাদ সম্পর্কে চিন্তার অনুন্নত মানকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দেশে দেশে বিরাজ করছে। মার্কসের জীবদ্দশায়ই শোধনবাদের প্রসার ঘটেছে। মার্কসকে লড়াই করতে হয়েছিল বাকুনিন, প্রুঁধো লাসালের বিরুদ্ধে। লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শোধনবাদের বিরুদ্ধে বিশাল সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন শোধনবাদী নেতা প্লেখানভ, বার্নস্টাইন, কাউটস্কির বিরুদ্ধে। স্ট্যালিনকে সংশোধনবাদের কবল থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে রক্ষা করতে হয়েছিল ট্রটস্কি ও বুখারিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর মাও-সে-তুং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই পরিচালিত করেছিলেন, যেটি ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হিসাবে খ্যাত। কমরেড শিবদাস ঘোষ সোভিয়েত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে একটি নতুন দিক দেখালেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে নতুন রূপে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে উপরকাঠামোতে যে বিশেষ ধরনের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালাতে হবে, সে ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মার্কসবাদী বিজ্ঞান সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা হচ্ছে, "আমরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে এমন একটি বিষয় বলে মনে করিনা যার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে গেছে ও যা অলঙ্ঘ্যনীয়। বিপরীতে আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, এটা বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে মাত্র। সমাজতন্ত্রীরা যদি জীবনের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায়, তবে তাদের অবশ্য কর্তব্য একে (মার্কসবাদী তত্ত্বকে) সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করা।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে সংশোধনবাদের বিকাশ ও প্রতিবিপ্লবের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, "লেনিন পরবর্তীকালে মানব জীবনে এবং

শ্রেণী সংগ্রামের সামনে যে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনগত উপলব্ধির যে বিকাশ ঘটানো উচিত ছিল, লেনিনের পর তা আর করা হয়নি।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রয়োজন ছিল একদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চেতনার উন্নত মান বজায় রাখা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন পরিবেশে নতুন করে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটানো। ...এমনকি মার্কসবাদের যে সব তত্ত্বগুলোর আজও কার্যকারিতা রয়েছে, তারও উপলব্ধির বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে।" কারণ তিনি বললেন, "চিন্তা ও সংস্কৃতির মান অনুন্নত থাকলে, তা জটিল পরিস্থিতিতে যে কোনও মুহূর্তে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের জন্ম দিতে পারে, সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলতে পারে এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে, শান্তিপূর্ণভাবে হোক অথবা 'ভায়োলেন্স' (সমগ্র অভ্যুত্থান) এর মধ্য দিয়ে হোক – সমাজতন্ত্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিবিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে, তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা, সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনতে পারে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে কিভাবে সংশোধনবাদ এলো, তা দেখাতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রেণীসংগ্রাম যেখানে আবারও তীব্র করা দরকার ছিল, প্রোলেতারিয়ান সাংস্কৃতিক মানের চর্চা আরও উন্নত করা প্রয়োজন ছিল, পার্টির অভ্যন্তরে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়ান বিপ্লবী চরিত্রের মান উন্নত করার জন্য যেখানে ক্রমাগত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝাণ্ডটা খাড়া রাখবার দরকার ছিল, যেটা সমাজব্যবস্থা অনেকটা স্থিতি লাভ করার পর সোভিয়েত নেতৃত্বের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারই ফলে আদর্শগত-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের অবনতি, তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সংশোধনবাদ জন্ম নেওয়ার উর্বর ক্ষেত্র।"

স্ট্যালিনও শেষ জীবনে মার্কসবাদের উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝে ১৯৫০ সালে ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় বলেছিলেন, "বিজ্ঞান বলেই মার্কসবাদ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা, তা ক্রমাগত উন্নত ও বিকশিত হতে থাকে। মার্কসবাদ তার বিকাশের ধারায়ই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ না হয়ে পারেনা। ফলশ্রুতিতে, সময়ের গতিপথে তার (পূর্বেকার) কিছু সূত্র ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হয়ে পারেনা। নতুন সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা সেগুলি প্রতিস্থাপিত না হয়েও পারেনা। সর্বযুগ ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য অপরিবর্তনশীল সূত্র ও সিদ্ধান্ত মার্কসবাদ স্বীকার করেনা।" দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেনিন পরবর্তী কালে আরও অগ্রগতি প্রয়োজন ছিল একথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে ১৯৫২ সালে উনিশতম পার্টি কংগ্রেসে বলেছেন, "দর্শন, জীব বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের উপর নানা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের নানা শাখার তত্ত্বগুলির ভ্রান্তিগুলি উদঘাটিত হয়েছে।" আদর্শগত চর্চার গুরুত্ব নির্দেশ করে ঐ রিপোর্টেই স্ট্যালিন বলেন, "মতাদর্শের চর্চা করা পার্টির সর্বপ্রধান কর্তব্য। এর গুরুত্ব লঘু করে দেখলে পার্টি ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব দুর্বল হওয়ার মানে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকে শক্তিশালী করা।" মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর আধুনিক শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ-চক্র ক্ষমতা করায়ত্ত করে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকেই বাড়ালো, পরিণামে সমাজতন্ত্রের আদর্শ দুর্বল হয়ে গেল।

১৯৫১ সালে 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' রচনায় সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মকে ব্যাখ্যা করে স্ট্যালিন দেখান, উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির দ্বারা সমাজের ক্রমবর্ধমান বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টিবিধানই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম। ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী নেতৃত্ব পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর 'উৎপাদনের প্রাচুর্য ছাড়া সাম্যবাদ আসবেনা', 'আমেরিকার থেকে রাশিয়াকে উৎপাদনে এগিয়ে যেতে হবে', এসব কথা বলে যে কোনও উপায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এগোলেন। সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত উৎপাদন করার ঝোঁকে বুর্জোয়া লেবার ইনসেনটিভ চালু করলেন। এ জিনিস সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মকে শুধু লঙ্ঘনই করলো না, যে সর্বহারা সংস্কৃতি অর্থাৎ সামজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে একাত্ম করে দেয়ার আদর্শের ভিত্তিতে জনগণের

মধ্যে আত্মদানের মনোভাব সৃষ্টি করার কথা, তাতেও বাধা সৃষ্টি করল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, "যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে সাম্যবাদী অর্থনীতির প্রথম স্তরে যাওয়ার কথা – অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার প্রোগ্রাম গ্রহণ করার কথা, সে আজকে আবার পিছন ফিরে পুঁজিবাদী ইনসেনটিভের পদ্ধতি এনে দিল, পুঁজিবাদের প্রবণতা এবং স্পেকুলেশনের দরজা খুলে দিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কমোডিটি সার্কুলেশনের পরিধি বাড়িয়ে দিল, ব্যক্তিমালিকানার প্রভাবটা আরও বেশি করে এনে ফেলল। উল্টোকাণ্ড ঘটে গেল।" এইভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমানের জন্যই এটা ঘটল। চেতনার নিম্নমান থাকা সত্ত্বেও যে ভুল এতদিন হয়নি, শুধু স্ট্যালিনের নেতৃত্বের অনুপস্থিতির জন্য সেই ভুল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল জায়গাটায় আঘাত করে বসল।

কমিউনিস্টদের সংস্কৃতি যেমন যৌথতা তেমনই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ

ধর্মীয় মূল্যবোধের অবলুপ্তির পর যে মানবতাবাদী মূল্যবোধ পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে সমাজে এসেছিল, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ার যুগে, সেই মানবতাবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঝান্ডাকে পদদলিত করেছে। এদিকে আবার বিকল্প সর্বহারা মূল্যবোধও ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। ফলে সমাজজীবনে কোনো মূল্যবোধই কাজ করছে না। সর্বস্তরে তীব্র নৈতিকতার সংকট গ্রাস করছে, বিবেক মনুষ্যত্ব বিপন্ন হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন খুবই দুর্বল হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রে দেশে দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ শক্তিশালী হচ্ছে যা শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

একদিকে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট আবার অপরদিকে তীব্র সাংস্কৃতিক অবক্ষয় মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে, ব্যক্তিবাদী প্রবণতাকে উস্কে দিয়ে চরম স্বার্থপরতায় সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। শ্রমিক বিপ্লবী আন্দোলনকে এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আজকের যুগে যৌথতা গড়ে তোলা ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন আর এক পাও এগোবে না। তিনি দেখিয়েছেন দলের মধ্যে ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতির ভিত্তিতে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা তথা যৌথতা গড়ে তোলার লড়াই সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লড়াই এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। সকল প্রকার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাঝে এটির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। এ লড়াই যেমন জাতীয় পরিসরে করতে হবে তেমনি তা আন্তর্জাতিক পরিসরেও করতে হবে। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে হৃদয়ে ধারণ করে তাকে অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলতে হবে। এবং সেক্ষেত্রেও ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের ভিত্তিতে সমচিন্তা পদ্ধতি, সমচিন্তা, একই উদ্দেশ্যমুখিনতা এবং একই বিচারধারা গড়ে তুলতে হবে। এই প্রক্রিয়াতেই মার্কসবাদী আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং সেই নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে যে যৌথ সংগ্রাম গড়ে উঠবে লেনিনের ভাষায় তা এক মানুষের মত ক্রিয়া করবে। এটি একটি বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে যখন ক্রিয়া করবে তখন তা যে শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে সেটি দুর্ভেদ্য একটি অস্ত্র হিসাবে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার উপর ক্রিয়া করে তাকে পাল্টাতে সক্ষম হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রতিবিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। সংশোধনবাদের প্রকোপে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন আজ বিপর্যস্ত। বিশ্বপরিস্থিতিকে আপাতদৃষ্টিতে অন্ধকারাচ্ছন বলে মনে হবে, কিন্তু মার্কসবাদ দেখিয়েছে, যেখানে অন্ধকার সেখানে আলোও থাকে। ১৯৬৬ সালে চীনে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার সময় মহান নেতা মাও সে তুঙ বলেছিলেন, "চীনে যদি দক্ষিণপন্থীরা (শোধনবাদীরা) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ক্যু-দে-তা করে ক্ষমতায় আসে তা হলে আমি নিশ্চিত তারা শান্তিতে থাকতে পারবেনা এবং তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। কারণ বিপ্লবীরা, যারা নব্বই শতাংশ জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তার দক্ষিণপন্থীদের এই শাসন মেনে নেবে না।"

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে আজ যতই সংকট দেখা দিক, মহান মার্কস-এঙ্গেলসের সেই ভবিষ্যৎবাণী আমরা ভুলে যেতে পারিনা যে ; "বুর্জোয়ারা সর্বোপরি জন্ম দেয় তার নিজের কবর খুঁড়িয়েদের, তাই বুর্জোয়াদের পতন এবং সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় – দুই-ই অনিবার্য।"